নিউইয়র্ক

গেটিসবার্গ এড্রেস

১৮৬৩ সালের কথা অনেকেরই মনে আছে। গেটিসবার্গে হয়েছিল সিভিল ওয়ার। যেখানে আব্রাহাম লিংকন ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন

লিখেছেন ব্রুকলিন থেকে **গীতি**

যুদ্ধক্ষেত্রের মিনিয়েচার

প্র২৮ মে ছিলো আমেরিকায় মেমোরিয়াল-ডে, সরকরি ছুটির দিন। দিনটি ছিলো সোমবার। ফলে শনি, রবি, সোম– ৩ দিনের লং উইকএন্ডে অনেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো ভ্যাকেশন কাটাতে।

ঠিক করলাম শুক্রবার ইকবাল অফিস থেকে ৩টার মধ্যেই বাসায় চলে এলে ৫টার মধ্যে বাসা থেকে রওনা দেবো পেনসিলভেনিয়ার উদ্দেশে। আমাদের সহযাত্রীরা হচ্ছে– ইকবাল, আমি, তনিম, তাজ এবং শাহেদ। যাওয়া হবে শাহেদের মিডসাইজ লিমো করে। খরচ যা হবে, সবাই মিলে ভালো করে দেবো এই শর্ত হলো, কারণ আমাদের মধ্যে তাজের স্বভাব খুব খারাপ, বন্ধুদের জন্য অযথা সে বেশি বেশি খরচ করে। উপহার যাই হোক, ৩/৪ ঘন্টা ড্রাইভ করে আমরা রাতে ১টা মোটেলে থাকলাম, নিউ জার্সিতে। পরদিন শনিবার PNSL পৌঁছাতে দুপুর পার হয়ে গেলো। আমাদের লক্ষ্য ছিলো পেনসিলভেনিয়ার Lancaster County'র Amish পল্লীতে যাওয়া।

হ্যারিসন ফোর্ডের বিখ্যাত 'Witnes' ছবিটি যারা দেখেছেন তারা আমিশ পিউপলদের সম্পর্কে নিশ্চয় কিছুটা জানেন। এই আমিশরা নিজেদের জীবন পদ্ধতিকে সম্পূর্ণভাবে আধুনিক প্রযুক্তির আওতামুক্ত রেখেছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এরা ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবহার করে না, মোমবাতি এবং হারিকেন এদের জীবনকে আলোকিত করে। এরা মোটর গাড়ি ব্যবহার করে না, ঘোড়াচালিত কাঠের তৈরি গাড়িতে এদের যাতায়াত। এরা হালচাষ করে সম্পূর্ণ আমাদের দেশীয় পদ্ধতিতে– গরুর সাহায্যে বা ঘোড়ার সাহায্যে। কখনো কখনো নিজেরাই লাঙ্গল টানে। এদের পোশাক-আশাক সেই পুরনো আমলের কালো কোট-প্যান্ট-হ্যাট বা বড় বড় গাউন মাথায় টুপি। আধুনিক প্রযুক্তির অবদান আমিশরা স্বীকার করেন। তাদের বিশ্বাস প্রকৃতি তাদের যা দিয়েছে তাই যথেষ্ট, প্রাকৃতিক প্রযুক্তিতে তাদের আস্থা! এদের শিক্ষা ব্যবস্থাও পৃথক, অনেকটা আমাদের দেশে মাদ্রাসার মত। TV/রেডিও এসবের কোনো স্থান নেই এদের জীবনে! শস্য উৎপাদন এদের আয়ের অন্যতম উৎস। এছাড়া বিভিন্ন রকম হাতের কাজ, যেমন Quilt (নকশিকাঁথা) বা কাঠের পুতুল ইত্যাদিও তারা বিক্রি করে। এদের জীবন যাপন অত্যন্ত সহজ-সরল। এরা জন্মনিয়ন্ত্রণেও বিশ্বাসী না, ফলে প্রত্যেক ঘরেই ৪/৫ জন করে অন্তত বাচ্চা দেখা যায়। আমিশরা সবাই গোঁড়া জুইশ, অর্থাৎ ইহুদি।

এই আমিশ পল্লীতে যখন যাই, তখন তুমুল বৃষ্টি। কালো ছাতা মাথায় ক'জন আমিশ মানুষ দেখলাম রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কিছু আমিশ মহিলাকেও দেখলাম নিজেরাই গাড়ির ভেতরে বসে রশি হাতে ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ করে ঘোড়া-গাড়ি চালাচ্ছে!

আমিশরা এই এলাকার অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। দূর-দূরান্ত থেকে ট্যুরিস্টরা আসে আমিশ ভিলেজ দেখতে। ট্যুরিস্টদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন হোটেল, মোটেল ব্যবসা, গিফট শপ, ফটো স্টুডিও। যেখানে আমিশদের মত পোশাক থাকে, যে কেউ সেই সব পোশাক পরে, তাদের মত ছাতা হাতে সাদা-কালো ছবি ($30) তুলতে পারে, যা দেখে মনে হবে আপনি সেই আমলেরই মানুষ। এছাড়া আমিশ পল্লী ঘুরে দেখানোর জন্য এদের স্থানীয় ট্রেন ট্যুরও আছে।

তো শনিবার রাতে ওখানকারই এক মোটেলে থাকলাম। পরদিন রবিবার গেলাম পেনসিলভেনিয়ার বিশাল এক আউটলেট মলে। আউটলেট হচ্ছে সব ব্র্যান্ড নেম জিনিসপত্র ফ্যাক্টরি দামে পাওয়া যায়।

সোমবার অর্থাৎ মেমোরিয়াল ডে-তে আমরা চলে গেলাম গেটিসবার্গে। এই জায়গা সিভিল ওয়ারের জন্য সুপরিচিতি। ১৮৬৩ সালে এই গেটিসবার্গেই সিভিল ওয়ার সংঘটিত হয়েছিলো। আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের মূল জায়গায় অবস্থিত ট্যুরিস্ট স্পটে গেলাম। ওখানে যুদ্ধক্ষেত্র ঘুরে দেখানোর জন্য বাসট্যুর ছিলো, গাইডসহ। ২ থেকে ২১/২ ঘন্টার এই ট্যুরে জনপ্রতি টিকিট ছিলো $27। তো সকাল ১১টার বাস ট্যুর নিলাম আমরা। মূল ব্যাটেল ফিল্ডের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে বাস এগুচ্ছে আর মাইকে ইতিহাস বর্ণনা করে যাচ্ছে গাইড। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে এখানে-ওখানে আজও সাজানো রয়েছে কামান, এছাড়া অসংখ্য মনুমেন্টও রয়েছে (১,০০০)। এই রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন আব্রাহাম লিংকন। যুদ্ধের ৪ মাস পর তিনি যে ২ মিনিটের ভাষণ দেন তা আজও ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে, এটাই ঐতিহাসিক গেটিসবার্গ এড্রেস। যেখানে তিনি বলেছিলেন '...This Nation, Under god, Shall have a new birth of freedom, and that this Government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth.'

গেটিসবার্গ ব্যাটল ফিল্ড

সিডনি

পলিমার নোটের কথা

অস্ট্রেলিয়ার টাকার গায়ে এদেশের মতো রাজনৈতিক কোনো নেতার ছবি থাকে না। ওখানে কবি, শিল্পী ইত্যাদি ব্যক্তিদের ছবি থাকে

বাংলাদেশে অতি সম্প্রতি পলিমার নোট বাজারে এসেছে। দশ টাকার এ নোটটি নাকি এখন পর্যন্ত অনেকে চোখে দেখার সুযোগ পাননি! মুহূর্তে বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে ১০ টাকার এ নোটটি। প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করা অনেকের প্রিয় হবি। বাংলাদেশের লোকজন 'নতুন নোট' সংগ্রহ করে আরেক ধরনের 'হবি'তে মেতে উঠল। ছোট ভাইকে লিখেছিলাম নতুন নোটটি কেমন তা জানাতে। দু' মাস পরে ও লিখল– এখনো পলিমার নোটটি দেখার সৌভাগ্য ওর হয়নি! অথচ এদেশে আমরা প্রতিনিয়ত পলিমার নোট ব্যবহার করছি। বাজারে সওদা ক্রয়, বাস-রেলের টিকিট ক্রয়, কেএফসি- ম্যাকডোনালস-পিজা হাটের খাবার ক্রয় কিংবা পোস্ট শপ থেকে এরোগ্রাম-স্ট্যাম্প ক্রয়, সব সময় আমরা পলিমার নোট বের করে দিচ্ছি। প্রতি দু'সপ্তাহ পর পর যখন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বাড়ি ভাড়া পরিশোধ করতে যাই, মানি ব্যাগ খুলে প্রতিবারই ৫০ ডলারের ছয়টা নোট এগিয়ে দেই। তিন শ' ডলারের রিসিট দিয়ে ব্রিজিট নামের মেয়েটি চশমার ফাঁক দিয়ে বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ফ্যাসফ্যাসে গলায় প্রতিবার বলে, 'থ্যাংক য়ু'। এখানে পলিমার নোট মোট ছয় ধরনের। ১০, ২০, ৫০ এবং ১০০ ডলার নোট প্রতিটি এক রকমের। শুধু ৫ ডলারের দু' রকম নোট প্রচলিত। এসব নোটের কোনোটাতেই কারো বাবা-দাদা বা নানা-নানির ছবি নেই। কোনো নেতা বা মহানেতার তাস্‌বিরও নেই এসব নোটের কোথাও। শুধু ইংল্যান্ডের রানীর ছবি আছে ৫ ডলারের নোটের একদিকে। অন্যান্য নোটে অস্ট্রেলিয়ার বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, আবিষ্কারকদের ছবি আছে। নিউজিল্যান্ডেও দেখেছি একই ধারা। সে দেশের ৫ ডলার নোটে এভারেস্ট বিজয়ী স্যার এডমন্ড হিলারীর ছবি। অন্যান্য নোটেও বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, অভিযাত্রী, বিজ্ঞানীদের ছবি। কোনো রাজনৈতিক নেতার ছবি কোনো নোটেই নেই। তবে নিউজিল্যান্ডে ১০ এবং ২০ ডলারের পলিমার নোট ছাড়া হয়েছে অতি সম্প্রতি। কেউ কেউ পলিমার নোটের বিরোধিতাও করছে। তারা পুরনো কাগজের নোটই চালু রাখার পক্ষপাতি। বাংলাদেশের মাছের বাজারের জন্য পলিমার নোট অত্যন্ত উপযোগী। তবে এ নোটে পিন মারা যায় না, কোথাও কেটে গেলে বা ফুটো করলে এ নোট ছিঁড়ে যাবে। এসব দেশে কেউ টাকার বড় বড় বান্ডিল নিয়ে ঘুরে না বলে পিন দিয়ে আটকানোরও দরকার হয় না। এখন পর্যন্ত কোনো ব্যাংকে টাকা গণনার মেশিন দেখিনি। কারণ, যন্ত্রে গণনা করার মতো এতো বেশি পরিমাণ নোট কেউ এক সাথে জমা দেয় না। উত্তোলনও করে না। বাংলাদেশের পলিমার নোটটি অস্ট্রেলিয়ার টাকশালে তৈরি। অস্ট্রেলিয়ার পলিমার নোটগুলোর ছবি দেখুন। এ লেখাটি কেউ পাঠালে খুশি হবো।

ডাঃ ওয়াহিদুজ্জামান
10/9 Fairmount St. Lakemba, Sydney, Nsw 2195 Australia

লন্ডন

স্বপ্নভঙ্গ

৭/৮ লাখ টাকা খরচ করে লন্ডন এসে যখন হোটেলে কাজ করতে হয় তখন অনেকেরই স্বপ্ন ভেঙে যয়। আফসোস হয় কেনো এলাম

আমাদের দেশের তরুণরা ইউরোপের মধ্যে যুক্তরাজ্যেই (ব্রিটেন) আসতে বেশি আগ্রহী। যুক্তরাজ্য বা ব্রিটেনের চেয়ে ইংল্যান্ডের ক্যাপিটাল সিটি লন্ডনই সমধিক পরিচিত। এই লন্ডনে এসে সোনার হরিণ ধরার জন্য পিতা-মাতার সারা জীবনের সঞ্চয় ৭/৮ লাখ টাকার কম হলে কৃষি জমি এমনকি বাসা-বাড়ি বিক্রি করে টাকার সংকুলান করতে দ্বিধাবোধ করছেন না। ৭/৮ লাখ টাকা দিয়ে বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে যারা লন্ডন এসে পৌঁছেন তারা নিজেদেরকে বিশ্বজয়ী মনে করেন। কিন্তু এই মনোভাব সপ্তাহখানেকের বেশি স্থায়িত্ব লাভ করে না। আত্মীয়-স্বজনের বাসায় দাওয়াত খেয়ে কয়েকদিন আরামেই কেটে যায়। শুভাকাঙ্ক্ষীরা যখন কাজের জন্য অনুসন্ধান শুরু করেন এবং কাজের ধরন (প্রকৃতি) সম্পর্কে বলতে থাকেন, তখনই কল্পনা রাজ্যের লন্ডনে সোনার হরিণ ধরার এতদিনের অসংখ্য রাত জাগরণের স্বপ্ন কাচের মত ভেঙে যেতে শুরু করে। বিদেশে যেতে ইচ্ছুক শতকরা ৯৯ ভাগ বাঙালির কোনো টেকনিক্যাল দক্ষতা নেই। বর্তমান উন্নত প্রযুক্তির যুগে এমতাবস্থায় যারা প্রবাসে আসেন তাদেরকে অল্প বেতনে অত্যন্ত কঠিন দৈহিক পরিশ্রমের কাজ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। দেশে থাকতে বেশির ভাগই দৈনিক বাজার খরচের ব্যাগ পর্যন্ত লজ্জায় বহন করেনি কমপেক্ষ ডিগ্রি পাস অর্থাৎ মোটামুটিভাবে ইংরেজি ভাষা বলতে ও বুঝতে পারা ছাড়া শতকরা ৯৮ ভাগেরই কর্মস্থল হল বাংলাদেশী মালিকানাধীন রেস্টুরেন্ট। সপ্তাহের ৬ দিন গড়ে ৭০ থেকে ৭৫ ঘন্টা কাজ করতে হয়। অর্থাৎ প্রতিদিন ১২/১৩ ঘন্টা। প্রথম দিনই কাজ শেষে রাত একটার পর আলালের ঘরের দুলালেরা যখন সহকর্মীদের সঙ্গে পরিশ্রান্ত হয়ে রেস্টুরেন্টের ওপরে ঘুমানোর রুমে যান তখনই বলতে শোনা যায় ভুল করেছি, কেন লন্ডন এলাম ৮ লাখ টাকা খরচ করে! নিজের দেশে এক লাখ টাকা দিয়ে যে কোনো ব্যবসা করলে মা-বাবা, বউ-বাচ্চাদেরকে নিয়ে অনেক সুখে থাকতে করতাম। আফসোস করা এবং ৮ লাখ টাকা খরচের দিকে চেয়ে কষ্ট করে অপছন্দনীয় কাজ করা ছাড়া তখন কোনো গত্যন্তর থাকে না। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে এদেশে কাজ করতে হয়, যা আমি লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে অপারগ।

আবদুল লতিফ
22 Herper Road, London, SE16AD

বিজ্ঞাপন

নিউইয়র্ক

নেশার লাটিম

কথায় বলে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। আর নেশার দ্রব্য দুনিয়ার কোথায় পাওয়া যায় না। গাঁজা সেবন করে মহারাজা বনে যাওয়ার মতো আনন্দ আর কোথায় আছে

১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। সেবার প্রচন্ড শীত। তাপমাত্রা কোনো কোনো দিন ৫ ডিগ্রি ফারেন হাইটে নেমে আসে। আমেরিকায় অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। বলা নেই কওয়া নেই চাকরিটা চলে গেল। দুঃখে পড়ে গেলাম।

ঢাকায় এমন হালকা পাতলা দুঃখ এলেই আমরা ৩ বন্ধু মিলে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তিন নেতার মাজারের পূর্বদিকে ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে গাঁজা খেতাম। নিউইয়র্কে একাকী বাস। বন্ধু বান্ধব প্রিয়জন এমন কি পরিচিত কেউ ছিল না সে সময়টাতে। ভাবলাম আবার গাঁজা ধরবো। পাবো কোথায়? কথায় বলে, 'গাঁজাখোরের নাক কুত্তার নাককেও হার মানায়।' প্রাক্তন এক সহকর্মী কিউবান যুবকের সহায়তায় জোগাড় হলো। চিলি ও নিকারাগুয়া থেকে আসতো গাঁজা। প্রথম দিনেই গাঁজা খেয়ে দুঃখ আরো শত গুণ বেড়ে গেল। বিশ্রী সাধ। মরা গরুর গন্ধ। গাঁজা খাওয়া নয়তো যেন রাজাকার সম্রাট গোলাম আযমের গালে চুমা খাচ্ছি। একদিনেই ঘেন্না ধরে গেল। নেশার এই জগৎটা বর্ণময়। সিগারেট, মদ, বিয়ার, লিকুইড নিকোটিন, মেডিক্যাল মারিজুয়ানা, এলএসডি, হালের এসওএস, পট, ফেনসিডিল ইত্যাদি সব মিলিয়ে আলাদা একটা ভুবন। আমরা জানি পুঁজিবাদী বৃহৎ দেশ হতে শুরু করে বিশ্বের দরিদ্রতম উন্নয়নশীল দেশটির সরকার ও সরকারি প্রশাসন সবাই সুকৌশলে এই ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং এর থেকে রাজনৈতিক ফায়দা গ্রহণ করে। কথাটা কি একটু শক্ত হয়ে গেল না? উদাহরণ নিন। দুটি বই পড়তে হবে। ১. Deep Cover ২. Big White Lies. বই দুইটির লেখক Mike Levin. এই মাইক সাহেব ২৫ বছর এফবিআই-এর সদস্য ছিলেন। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন সরকারের গোয়েন্দা ছিলেন তিনি। বই দুটি পড়লে পরিষ্কার হয়ে যাবে কি ঘৃণ্য উপায়ে মার্কিন সরকার নিজস্ব এজেন্ট দিয়ে দেশে নেশা করার মাল-মশলা আমদানি করতো ১৯৬০-এর দশকে এবং তা বিতরণ করতো নিগ্রোদের (আফ্রিকান বংশোদ্ভূত আমেরিকান) মাঝে। সেই সময়টাতে কালো চামড়ার মানুষদের অধিকারের আন্দোলন চলছিলো ডক্টর মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের নেতৃত্বে। আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করার জঘন্য একটা কৌশল ছিল এটা। Public Health Issue মনে করে নেশা ও মাদকাসক্ত Political Action হিসেবে রাজনৈতিক কর্মী ও সামাজিক আন্দোলনের কর্মীদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে ১৯৮৫ সালে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি শহরে নানা ধরনের সভা সেমিনার শুরু হয় তখন থেকেই। নেশাগ্রস্ত অসুস্থ মানুষদের চিকিৎসার লক্ষ্যে ৯০ দশকের প্রথম দিকেই আবিষ্কার হয় 'মেথাডোন'। কিন্তু মেথাডোন ফলদায়ক ওষুধ হিসেবে সফল হতে পারেনি। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এর কোনো বিকল্প ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতেই যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যে মার্কিন সরকার আণবিক বোমা আবিষ্কার ও তৈরির প্রকল্প গ্রহণ করে। যার কেতাবী নাম ছিল 'ম্যানহাটন প্রজেক্ট', মানবতাকে ধ্বংস করার জন্যই ছিল সেই মহা পরিকল্পনা।

বাংলাদেশে যে সব বিজ্ঞ ডাক্তার নেশাগ্রস্ত মানুষদের চিকিৎসা করে থাকেন তাঁদের জন্য একটা অতি জরুরি বই হচ্ছে Ibogaine, যার অন্যতম লেখক পল ডিরিয়েঞ্জো। ৩৫০ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য মার্কিন ৫০ ডলার। প্রাপ্তিস্থান : ৯ নং ব্লীকার স্ট্রিট, নিউইয়র্ক শহর। ওদের ফোন নম্বর ১-২১২-৬৭৭-৭১৮০

S.U. Ahmed, P.O Box # 20715, London Terrace Station, New York, NY 10011-9993, U.S.A

বোলছানো

বাংলাদেশী তরুণীর কৃতিত্ব

রুখসানা বেগম

ভাষাগত সমস্যা এবং হাজার প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশী ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে নেই। তারা একের পর এক ছিনিয়ে আনছে জয়ের মালা, স্থান করে নিচ্ছে এ দেশের পত্র-পত্রিকার পাতাতেও। প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি ইটালির বোলছানোর Instituto Professionale Comerciale-এর ছাত্রী রুখসানা বেগম ২০০০-২০০১ সালের মেধা তালিকায় প্রাদেশিক পুরস্কার (Borsa di Studio) লাভ করেছে। ১৯৮৩ সালের ১২ নবেম্বর সিলেটের কানাইঘাট জেলায় রুখসানার জন্ম। ১৯৯৮ সাল থেকে সে ইটালিতে লেখাপড়া করছে। ইটালিতে আসার পর ভাষাগত সমস্যা কাটিয়ে উঠতে রুখসানার তিন মাস সময় লাগে বলে জানা যায়। বর্তমানে সে ইনস্টিটিউট প্রোফেশনাল কমার্শিয়াল-এর একজন কৃতী ছাত্রী। কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়ায় রুখসানা বলে, 'ভীষণ ভালো লাগছে, বিশেষ করে বাবা-মায়ের মুখে হাসি দেখে।' সিরাজুল হক ও মিসেস হকের একমাত্র কন্যা রুখসানা ভবিষ্যতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে চায়। **Iffat Arag 390 40 Termeno (BZ), Italy**

বিজ্ঞাপন